গানের পাখি খাঁচার পাখি

মিজানুর রহমান রানা

এক.

'সাগর সৈকত' নামটা শুনলে যে কেউ ভাবতে পারেন হয়তো এটা সাগরের কোনো সৈকতের নাম। কিন্তু তা' নয়। এটা একটা বাড়ির নাম। গাজীপুর জেলায় এ বিশাল বাড়িটায় নানা দুর-দুরান্ত থেকে মানুষ আসে। কেউ বা পিকনিক করতে, আর কেউ একান্তে কিছু সময় কাটাতে। এখানে হোটেল-মোটেল থেকে বেড়ানোর জায়গা, বিনোদন সব কিছুই আছে।

এখানেই রুমির সাথে আমার পরিচয়। একদিন নিরিবিলি আলাপচারিতায় সে বলতে আমাকে লাগলো, 'মানুষের জীবনে কখনো এমন একটা সময় আসে, যখন সবকিছুকেই অর্থহীন বলে মনে হয়। কোনো কিছুতেই মন বসে না। এমনকি খাওয়া-দাওয়াও তখন মনে হয় অর্থহীন, অকারণ। এই যে আমি বসে আছি এই বাগানটায়, চারদিকে ফুলের সৌরভ, বিশাল খোলা আকাশের বুকে পাখিরা উড়ছে, বাতাসে গাছের পাতাগুলো নড়ছে। আমার মনে হয় এসবও অর্থহীন। আমার কোনো কিছু ভালো লাগছে না বলেই এখানে এসেছিলাম। কে একজন বলেছিলো, এখানে নাকি দেখার অনেক কিছুই আছে। আজ দু'দিন যাবত আছি এখানে, প্রতিদিন হোটেল ভাড়া বাবদ বারো শ' টাকা করে নিচ্ছে। কিন্তু আমার যে কিছুই ভালো লাগছে না। কী করব আমি? কোথায় গেলে একটু সুখ পাই? হায়রে সুখ, হায়রে শান্তি। আমার থেকে এসব মনে হয় যোজন যোজন দুরে অবস্থান করছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো রুমি।

রুমির কথাগুলো শুনতে শুনতে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম মনের এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। সে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিজস্ব কিছু কথা স্মৃতি হয়ে অনেক বছর যাবত বাস করছে। কিন্তু আমি সেগুলোকে অন্ধকারেই রেখেছি; আলো জ্বালিনি। কী লাভ, জীবনের এসব ছেঁড়াফাটা কাহিনী অপরকে শুনিয়ে!

দুরে কোথাও বাজছে অমর সেই গানটা। যা আমাকে নিরিবিলি বিচরণরত গানের পাখিতে পরিণত করেছিলো, জীবনকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলো। গানটি শুনছি আমি তন্ময় হয়ে:

'ভালোবাসা....ভালোবাসা তার আর কোনো নাম নেই...
'ভালোবাসা....ভালোবাসা তার আর কোনো নাম নেই...
ভালোবাসা ....ভালোবাসা........ভালোবাসা....মন ছাড়া কোনো নাম নেই।
একটু দেখা একটু কথা...একটুখানি পরিচয়
একটু দেখা একটু কথা...একটুখানি পরিচয়
ধীরে ধীরে কলি ফুটে ফুল হয়
ভালোবাসা শেষে হয়ে যায়।
'ভালোবাসা....ভালোবাসা তার আর কোনো নাম নেই...ভালোবাসা...।

যায় না বলা, যায় না বোঝা কোথায় ব্যাথা কেন হয়
যায় না বলা, যায় না বোঝা কোথায় ব্যাথা কেন হয়
এমন ব্যাথা সবাই পেতে চায়
ভালোবাসা হলে এমন হয়....
'ভালোবাসা....ভালোবাসা তার আর কোনো নাম নেই...

ওয়েটার চা এনে রাখলো টেবিলে। তাকে বললাম, 'শুধু চা এনেছো কেন? সাথে কিছু দিতে পারতে!'

'আপা বলেছিলো শুধু চা-ই পান করবে। তাই..'। ওয়েটারের ভান করা মৃদু হাসি।

'হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে, আমিই বলেছিলাম শুধু চা-ই আনতে। আপনি কি অন্য কিছু খাবেন?' রুমি প্রশ্ন করলো আমাকে।

'আসলে বিকেলে চায়ের সাথে আমি সাধারণত দু'একটা বিস্কিট খাই। তাতে চায়েরও স্বাদ পাওয়া যায়, আর মনেও আসে প্রশান্তি।' আমি অদুরে একটা শিরিষ গাছে কিচিরমিচিররত গানের পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে বললাম।

রুমি ওয়েটারকে ভালো কিছু বিস্কিট আনার জন্যে বললো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি এখানে কতদিন যাবত আছেন?'

'প্রায় তিন মাস।'

'তিন মাস! কেন? একেলা মানুষ নাকি? বাবা-মা কেউ নেই?'

'না।'

'বলেন কি? কী হয়েছে তাদের?'

আমি প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলাম। কারণ একটা এক্সিডেন্টে আমি ছাড়া আমার পরিবারের সব সদস্যদের নিহত হবার খবর তাকে শুধুই বিচলিত করবে, প্রশান্তি দেবে না। ওয়েটার বিস্কিট নিয়ে এলো। বললাম, 'নিন, চা নিন।'

চায়ের সাথে বিস্কিট চুবিয়ে খেতে খেতে রুমি বললো, 'দেখুন আপনার সম্পর্কে আমি যা জেনেছি। তা' হলো....।' থেমে গেলো রুমি। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম।

রুমির পাশে এসে অচেনা একজন লোক দাঁড়ালো। রুমি সে লোকটার পানে তাকিয়ে আছে। লোকটিও রুমির দিকে তাকিয়ে আছে কঠিন দৃষ্টিতে। হঠাৎ করেই রুমি উঠে দাঁড়ালো। তারপর আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে লোকটিকে বললো, 'এখানে কী চান আপনি?'

লোকটি কোনো কথা বললো না। আস্তে আস্তে রুমির দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। রুমি বললো, 'কাছে আসবেন না। তাহলে আমি চিৎকার করবো।'

এবার মুখ খুললো লোকটি, 'তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তোমার ওপর আমার অধিকার আছে। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। চল আমার সাথে।'

'না। আমি যাব না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তোমাকে আমি স্বামী হিসেবে মানি না। তুমি আমার স্বামী নও। আমি তোমাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ?'

'পেয়েছি। কিন্তু তুমি কেন আমাকে ডিভোর্স দেবে? কী দোষ আমার?'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম; ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু তোমার যে মুখোশের আড়ালে বিষধর সাপের ফণা লুকিয়ে আছে তা' জানতাম না। মাত্র একমাসের বিবাহিত জীবনে তুমি আমার জীবনটাকে জাহান্নামে নিয়ে গেছো। প্রতিদিন পুলিশের লোকেরা তোমাকে তাড়া করে; কেন করে?'

'সত্যিই তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ রুমি?' কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো লোকটা।

'হ্যাঁ, তুমি আর কখনো আমার কাছে আসবে না। তোমাকে আমি ঘৃণা করি, চরম ঘৃণা!'

লোকটি আর কোনো কথা বললো না। এক মিনিট কী যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'ঠিক আছে। আর আসবো না। তবে মনে রেখো, তুমি কখনো সুখী হতে পারবে না। অপরকে দুঃখ দিয়ে নিজে কখনো সুখী হওয়া যায় না।' লোকটি আস্তে আস্তে চলে গেলো।

আমি এতক্ষণ যেন কোনো সিরিয়াল নাটকের খণ্ডিত অংশ দেখছিলাম। যা এখানেই আমার সামনে লাইভ অভিনীত হচ্ছিলো। লোকটা চলে গেলে রুমি এসে আমার পাশে বসলো। তারপর মাথাটা নুয়ে টেবিলের ওপর রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে রুমিকে ডাক দিলাম। সে মাথা উঠিয়ে আমার দিকে তাকালো। তার চোখ লাল হয়ে আছে।

দুই.

রুমি তার জীবনের সেসব কাহিনী আমাকে বললো। জীবনের অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে সে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তার জীবনের স্বপ্ন-সাধনা ও শ্রমে-ঘামে গড়া একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান আছে। সে নিজেও গান রচনা করে; গীতিকার। তার প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক শিল্পীকে সে প্রতিষ্ঠিত করে গানের অ্যালবাম বের করেছে। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানের সুনাম আকাশচুম্বি, ব্যবসাও ভালো করছে সে।

ঠিক তখনই তার জীবনে এসেছিলো সোহাগ নামের সেই লোকটি। সোহাগ একজন শিল্পী, যাকে রুমিই এ জগতে প্রতিষ্ঠা করেছিলো। পরবর্তীতে এ সোহাগকে সে ভালোবেসেছিলো এবং বিয়ে করেছিলো। কিন্তু বিয়ের এক মাস যেতে না যেতেই সে দেখলো সোহাগের বদঅভ্যাসগুলো। সে অনেক রাত করে বাসায় ফেরে, মাঝে মাঝে নেশাও করে এবং অসংলগ্ন ভাষায় কথা বলে। এমনকি রুমিকে মারধরও করে। পরিশেষে নিরুপায় হয়ে রুমি তাকে ডিভোর্স লেটার পাঠায়। কিন্তু লোকটি আঠার মতো রুমির জীবনে লেগে থাকে। রুমি কোথাও গেলে লোকটিও সেখানে যেয়ে তার সম্মানহানি করে। ফলে রুমি সারাক্ষণ ভয়ে কুঁকড়ে থাকে। এভাবে যেতে যেতে একদিন তার মা তাকে পরামর্শ দেয়, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসার জন্যে, ফলে তার মনে আসবে প্রশান্তি। রুমি মায়ের কথা মতো এখানে বেড়াতে এসেছিলো একাকী সময় কাটাবার জন্যে। কিন্তু লোকটি এখানে এসেও হাজির!

রুমির জীবনের বিষাদময় কাহিনী শুনে রুমিকে বললাম, 'এভাবে নিজকে গুটিয়ে রাখাটা তোমার ঠিক হবে না। তাহলে দেখবে তোমার মধ্যে যে সম্ভাবনায় প্রতিভা ছিলো তা' এক সময় মরে গেছে। তুমি নিজেও ক্রমশ বিলীন হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং তুমি ওই উদার আকাশ, বিচরণরত মুক্ত গানের পাখি ও মেলেধরা বিকশিত ফুলকে দেখো। তারা কখনো ভয় পায় না; ব্যথায় কুঁকড়ে নীল হয় না। তারা তাদের অবস্থানে থেকে নিজকে পরিপূর্ণ করে তুলছে।'

রুমি আর আমি হেঁটে হেঁটে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, 'দেখো ওই যে বিশাল আকাশ। ওই আকাশের কাছ থেকে শেখার অনেক কিছু আছে। আমি আমার জীবনের সব দুঃখগুলো ওই আকাশের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছি। আকাশ আমাকে নির্মল হতে সাহায্য করেছে। আমার আর কোনো দুঃখ নেই। আমি সারাদিন ফুলের সৌরভ, পাখির গান, আকাশের উদারতা দেখি। পাখি যেমন স্বাধীন, আমি নিজেও তেমনি স্বাধীনভাবে চলি। কোনো বন্ধনে জড়াই না। যখন যেখানে খুশি চলে যাই। ফলে আমার মনটাও সুখী থাকে। পৃথিবীর কোনো দুঃখ আমাকে জড়াতে পারে না।'

রুমি কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলো। সে আমার পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো, তারপর বললো, 'তুমি কি কবি? কবিতা লেখ?'

'না। তবে একটু-আধটু লেখি। ব্যাস।'

'তোমার কথাগুলো কবিতার মতো লাগে আমার কাছে। আমি কবিতা খুব পছন্দ করি।'

'তাই নাকি? শোন মেয়ে, যারা কবিতা পছন্দ করে তাদের মন তো নির্মল থাকার কথা। তোমার মনে কেন এত ব্যথা পুষে রাখো? কখনো মনের মাঝে ব্যথা, দুঃখ-যন্ত্রণা পুষে রাখবে না।'

রুমির সেলফোনে রিং হয়। সে কার সাথে যেন কথা বলে। কথা শেষ হলে সে বললো, 'তার অফিস থেকে ফোন এসেছে। তাকে পরদিনই যেতে হবে। কারণ সামনে ঈদ। কয়েকটি অ্যালবাম রিলিজ হবার কথা। কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে।'

রুমি পরদিন চলে গেলো। আমি কাজে মনোনিবেশ করলাম।

কয়েকদিন পার হলো। হঠাৎ একদিন আবার রুমি এসে হাজির। আমি চমকে গেলাম। সে বললো, 'জানো, আমি চলে যাবার পর কোনো কাজে মনোনিবেশ করতে পারিনি। সারাক্ষণ তোমার কথাগুলো আমাকে ভাবায়। কেন জানি তোমার প্রতি আমি কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করি। আমি কি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি?'

‘সেটা তো তোমার উপলব্ধির ব্যাপার, আমার জানার কথা নয়। তবে একটা কথা, আমি কিন্তু বনের পাখি, গানের পাখি। স্বাধীনভাবে বিচরণ আমার স্বভাব, আমাকে খাঁচায় পুরতে যেয়ো না। তাহলে আমার ডানা ভেঙ্গে যাবে।’

রুমি অবাক হয়ে বললো, ‘বলো কি তুমি? আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, কিন্তু তোমাকে খাঁচায় বন্দী করলাম কখন?’

‘রুমি, ভালোবাসলে মানুষ এককেন্দ্রিক হয়ে যায়। সমস্ত চিন্তা-ভাবনা একমুখী হয়। ফলে সে মানুষটি ভালোবাসার জালে বন্দী পাখির মত তড়পায়। বনের পাখি, গানের পাখি স্বাধীনভাবে চলার অভ্যেস, তাকে ঘরে নিয়ে বন্দী করে রাখলে সে গানও ভুলে যায়।’

‘তবুও আমি তোমায় ভালোবাসি।’

‘তোমার আমার দুরত্ব অনেক। আমাকে ভালোবেসে তুমি দুঃখ ছাড়া কিছুই পাবে না।’

রুমি কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, ‘তোমার আমার দুরত্ব এখানেই শেষ। দেখো আমি তোমার কত কাছে চলে এসেছি।’

তিন.

রুমির সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল। রুমির কি বিশাল বাড়ি! বাড়িটার দাম হতে পারে কয়েক কোটি টাকা। আমরা বিয়ের পর এখানেই আছি, বলা যায় মহাসুখেই। আমার যেহেতু কোনো কাজকর্ম নেই; তাই বাড়িতেই থাকি। সে অফিসে যায় সকালে, ফেরে রাত আটটা-দশটায়। মাঝে মাঝে খুব পরিশ্রান্ত মন ও শরীরে বাসায় ফেরে। তখন তার মেজাজ থাকে সপ্তমে।

একদিন আমি বসে বসে এন. টিভিতে একটি গানের প্রোগ্রাম দেখছিলাম। এমন সময় রুমি অফিস থেকে এলো। আমি বললাম, ‘রুমি তোমার তো খুব পরিশ্রম হয়, তাই না। আমি তোমার কষ্টের ভাগীদার হতে পারি। সারাদিন তো বসেই থাকি বাড়িতে, ইচ্ছে করলে আমি তোমার অফিসে যেয়ে তোমার কাজের...।

‘থাক আর বলতে হবে না। তুমি আমার অফিসে কাজ করলে আমার সমস্যা হবে। লোকেরা জানবে তুমি বেকার। আমি বলেছি আমার স্বামী একজন ইঞ্জিনিয়ার।’

‘তুমি মিথ্যে বলতে গেলে কেন?’ আমি আহত পাখির মত ডানা ঝাপটালাম।

‘তাহলে কী বলবো? আমার স্বামী বেকার, ঘরে সারাদিন বসে থাকে। কোনো কাজকর্ম করে না। তা’ই বলবো?’ রুমি ঝাঁঝের সাথেই কথাগুলো বললো।

আমি থ’ বনে গেলাম। এই কী সেই রুমি!

এভাবেই চলছিলো আমাদের জীবন। চলে যায় আরো কিছু সময়। আমি দেখলাম, আগের সেই রুমি আর এখনকার রুমির আকাশ-পাতাল ব্যবধান। সে আমাকে অবাঞ্ছিত ভাবে সারাক্ষণ। আমি নাড়াচাড়া দিলাম শরীরটা, মনকে। তার অগোচরে আমি আবার আমার আগের অবস্থানে সবার সাথে যোগাযোগ করলাম। অ্যালবাম প্রকাশকরা বললো, ‘দেখুন মিস্টার আপনার গানের অ্যালবাম মার্কেট করে কখনো লোকসান গুণিনি; লাভই করেছি। কিন্তু আপনি হঠাৎ করে গান লেখা বন্ধ করে দিলেন, আমাদেরকেও গান দিলেন না। কেন? সামনেই ঈদ। এখনই তো আমাদের ব্যস্ততা। ঈদের আগেভাগেই গান সংগ্রহ এবং রেকর্ডিংয়ের কাজ শেষ করতে হবে। মার্কেটে আপনার গানের চাহিদা প্রচুর। আপনি সজাগ হন। আপনার রচিত গান লোকেরা খুবই পছন্দ করে।’

আমি দিন-রাত পরিশ্রম করে প্রায় ৩০টি গান রচনা করলাম। একদিন রাতে টেবিলে বসে বসে গান লিখছি। এমন সময় রুমি ঘুম থেকে জেগে আমার কাছে এসে বসলো। বললো, ‘এত রাতে জেগে জেগে কী লেখ? প্রেমপত্র নয়তো?’

‘জীবনের সাথে প্রেম।’ আমি বললাম।

রুমি ঝুঁকে আমার লেখার দিকে মন দিলো। তারপর বললো, ‘কবিতা লিখছো?’

‘না। তেমন কিছু নয়। অবসর সময় কাটাচ্ছি।’

‘ওঃ তোমার জীবটাতো আবার অবসরের মধ্যে কাটে। তা’ এতরাত্রে কেন জেগে জেগে লিখছো, দিনে লিখতে পারো না?’

‘কোলাহলের মাঝে আমি লিখতে পারি না। ভালো কিছু লিখতে হলে নির্জনতা লাগে।’

‘ভালো কিছু! তাই নাকি? লেখো, লিখতে থাকো। আমি ঘুমাই।’

পরদিনই গানগুলোর পাণ্ডুলিপি রেডি করে তিনজন অ্যালবাম প্রকাশকের হাতে তুলে দিলাম। তারা আমাকে আগ্রহভরে টাকাগুলো অ্যাডভান্স করে দিলো। আমি বললাম, ‘থাক না, পরে দিলেও চলবে। আমি তো টাকার জন্যে লিখি না, শুধু মনের টানে..।’

‘আরে রাখেন মশাই। তেল ছাড়া গাড়ি চলে না। আপনার লেখা গান পেয়েছি এটাই যথেষ্ট। টাকা নেবেন না কেন?’

চার.

ঈদের প্রায় তিন দিন পরের কথা।

রুমি মাঝে মাঝে এমনসব আচরণ করে। যা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। কেন জানি সারাক্ষণ খিটখিটে আচরণ করে সে। আমি বললাম, ‘রুমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।’

‘বলো।’

‘আমার দিকে তাকাও।’

‘দেখো রুমি, আমি বনের পাখি ছিলাম। মুক্তভাবে গান গাইতাম, আমার কোনো পিছুটান ছিলো না। নিজের ইচ্ছেমতো চলতে পারতাম, লিখতে পারতাম। আর এখন আমার ডানা ভেঙ্গে গেছে। আমি পড়ে আছি বদ্ধ জায়গায়। তাছাড়া তুমিও আর আগের মতো আমাকে তেমন পছন্দ করছ না। হয়তো আমিই তোমার সাথে মানিয়ে চলতে পারছি না। এভাবে তো চলা যায় না। আমি চাই....।’

রুমি আমার দিকে তাকালো। তার চোখে অশ্রু। সে বললো, 'তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাও? তাহলে যাও। তবে শুনে রাখো আমি তোমাকে ভালো ঠিকই বাসি। কিন্তু আমি খুবই সমস্যায় আছি বলে তোমার সাথে হয়তো মাঝে মাঝে উল্টাপাল্টা আচরণ করি। আমার জায়গায় তুমি হলে হয়তো তোমারও আমার মতই ভুল-ভ্রান্তি হতো। আমি....।'

'বলো, থামলে কেন?'

'তুমি জানো না আমি কি বিপদের মধ্যে আছি! আমার এ বাড়িটা নিলাম হয়ে গেছে।' হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো রুমি।

আমি রুমিকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, 'কী হয়েছে?'

'আমি বাড়িটা মরগেজ রেখে ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা নিয়েছিলাম। কিন্তু যথাসময়ে সে টাকা শোধ করতে পারিনি। আগামীকাল বাড়িটা নিলাম হয়ে যাবে। নিলাম হয়ে গেলে বাড়িটা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

'আমাকে তুমি একথাগুলো আগে জানাওনি কেন?'

'আমি তোমাকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলতে চাইনি। একথা শুনলে তুমি অযথা চিন্তা করতে, দুঃখ পেতে।'

আমি রুমিকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরে থাকলাম। বললাম, 'রুমি কেঁদো না। আমার দিকে তাকাও। বাড়িটা নিলাম হয়েছে তো কী হয়েছে! আমাদের মন তো নিলাম হয়ে যায়নি।'

'আমরা এখন কোথায় যাব? আমাদের থাকার জায়গা তো নেই।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'রুমি তুমি আসলে কোনোদিন আমার ব্যাপারে জানতে চাওনি। আমিও বলিনি। একটা কথা শুনবে?'

'বলো।'

'আমার আসল নাম তুমি জানো। কিন্তু তুমি আমার ছদ্মনাম জানো না। এ নামে লেখালেখি করি। আমার ছদ্মনাম হুমায়ুন সিদ্দিকী।'

রুমি তড়াক করে বসা থেকে লাফিয়ে উঠলো। বললো, 'তুমি হুমায়ুন সিদ্দিকী? তুমি তো তোমার নাম বলেছিলো হুমায়ুন কাদের।'

'হ্যাঁ। হুমায়ুন কাদের আমার পিতৃপ্রদত্ত নাম। কিন্তু সঙ্গীত জগতে, গান রচনার জগতে আমি হুমায়ুন সিদ্দিকী নামটি লিখি। আমার পিতার নাম সিদ্দিকুর রহমান। তাই পিতার নামটা নিজের নামের সাথে ব্যবহার করি।'

'তুমি হুমায়ুন সিদ্দিকী। এত বড় মাপের গীতিকার! আমি তো জানতাম না।' রুমি আবেগে আত্মহারা। 'আমি তোমাকে কত অবহেলা, তিরস্কার করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিও।'

'রুমি, আমি আমার নাম প্রকাশের জন্যে কথাটা বলিনি। কোনো কবি, লেখকই যেমন তার নাম জাহিরের জন্যে লেখালেখি করে না। তেমনি সঙ্গীত জগতেও যারা আজ প্রতিষ্ঠিত তারাও নাম প্রচারের জন্যে সঙ্গীত সাধনা করে না। সঙ্গীত যেমন একটা সাধনার বিষয়, তেমনি সঙ্গীত রচনাও একটা সাধনার বিষয়। সবাই নবী হয় না, সবাই কবি হয় না। তেমনি সবাই তো আর গায়ক, গীতিকার হতে পারে না। শুধু সে-ই হতে পারে যার মধ্যে সাধনার চেষ্টা আছে। শোনো, যার জন্যে আমি তোমাকে আমার নামটি বলেছি সে কথা তুমি কি বুঝতে পেরেছ?'

'না।'

'তোমার বাড়ি তো নিলাম হয়েছে, সেজন্যে তুমি রাজ্যের টেনশনে ছিলে। আমি যদি আমার বাড়িটা তোমাকে উপহার দেই?'

বিস্ময়ে থ' বনে গেলো রুমি। তোমার বাড়ি?'

'হ্যাঁ, আমার একটা বাড়ি আছে গাজীপুরে।'

'গাজীপুর?'

'যেখানে তোমার আমার পরিচয় হয়েছিলো; সাগর সৈকত।'

'আমি যেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেই সাগর সৈকতই তোমার বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি যে তখন বলেছিলো সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলো?'

আসলে এ পৃথিবীতে তো সবাই আমরা বেড়াতে এসেছি। দু'দিন পরে সবাই চলে যাবো। আমরা সবাই মুসাফির। তাই পৃথিবীর শান-শওকত, সম্পত্তি এগুলোর পরিচয় না দেয়াই ভালো। তোমার কাছেও প্রকাশ করতাম না। যদি না তোমার বাড়িটা নিলাম হতো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সাগর-সৈকত নামের বাড়িটা তোমার নামে লিখে দেবো।'

টিভির স্ক্রীনে নজর পড়লো রুমির। লেখক হুমায়ুন সিদ্দিকীর তিনটি বই বাজারে এসেছে এবং বইগুলো বেশি সংখ্যক পাঠক কিনেছে বলে মন্তব্য করছে ওরা। সেই সাথে বইমেলায় দেখা যাচ্ছে হুমায়ুন সিদ্দিকীর অটোগ্রাফ নেবার জন্যে ছেলে-বুড়োদের ভিড়। হুমায়ুন সিদ্দিকী হাসিমুখে সবার সাথে কথা বলছেন, অটোগ্রাফ দিচ্ছেন।

রুমি অবাক বিস্ময়ে টিভি স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে। সে বললো, 'তুমি তাহলে উপন্যাসও লিখো? কী অবাক ব্যাপার, এমন একজন মানুষকে আমি কি-না কত অবহেলাই করেছি, বন্ধ ঘরে দমবন্ধ করে মারতে চেয়েছি। আসলে বনের পাখি-গানের পাখি বনেই মানায়, খাঁচায় নয়। সেখানে মুক্তভাবে গান গাওয়া যায়। চলো আমরা সেই বনেই আবার চলে যাই। যেখানে আমাদের প্রেম এসেছিলো, আমরা ভালোবেসেছিলাম। এখানে এই ইট-পাথরের খাঁচায় আমাদের প্রেম নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। তাছাড়া তোমারও লেখালেখি করতে অসুবিধা হয়। চলো।' রুমি হাত বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে।

আমি রুমির হাতে হাত রাখলাম। পরদিনই চলে গেলাম 'সাগর সৈকত' নামের বাড়িটায়।

রুমির বাড়িটা নিলাম হয়েছিলো। আমিও সেই নিলামে অংশগ্রহণ করি এবং সর্বোচ্চ দরে নিলাম ডেকে বাড়িটা খরিদ করে রুমিকেই তা' উপহার দেই।

রুমির জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। জীবন সম্পর্কে তার যে নেগেটিভ ধারণা ছিলো তা' পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

আমি সঙ্গীত রচনা ও সাহিত্য সাধনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, সে তার প্রতিষ্ঠান নিয়ে। তবুও মাঝে মাঝে তার প্রতিষ্ঠানে যেয়ে আমি তার কাজে সাহায্য করি; গান লিখে দেই। এরপর রুমির সাথে আমার আর কোনোদিন মানসিক দ্বন্দ্ব হয়নি। কারণ, তার কোনো কাজে আমি বিরক্তি প্রকাশ করি না, সেও আমার ব্যাপারে অনেকটা সহনশীল। উভয়ে উভয়ের চাহিদা বুঝি।

একদিন সকালবেলায় গানের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি জেগে উঠে দেখি রুমি কম্পিউটার ওপেন করে গান শুনছে। গানটি আমার অতি প্রিয়।

বুঝিনি তো আমি বুঝিনিতো আমি
পৃথিবীতে ভালোবাসা সবচেয়ে দামী।
সোনাদানা মোহরের বদলে
আসেনা তো সেযে কারো দখলে
প্রাসাদ ছেড়ে আমি পথে তাই নামি
বুঝিনি তো আমি...।

আমি আস্তে আস্তে শয্যা ছেড়ে রুমির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রুমি বললো, 'গানটির সত্যিকার মানে থেকে আমি ছিলাম বহু যোজন যোজন দুরে। কিন্তু জীবনের এ প্রান্তে এসে আমি বুঝতে পারলাম, পাখিকে খাঁচায় পুরে বড়জোর পোষ মানানো যায়, কিন্তু তার কাছ থেকে সুন্দর গান শোনা যায় না। যদি তাকে স্বাধীনভাবে রেখে ভালোবাসা যায় তাহলেই তার কাছ থেকে সুন্দর মনোহারী গান শোনা যায়। কথাটি আমি কখনোই বুঝতাম না। আজ বুঝলাম।'

আমি রুমির পানে ভালোবাসার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলাম। কারণ এই রুমি আজ যথার্থই অন্য এক রুমি। যে কি-না গানের প্রতি একজন সত্যিকার মানুষের ভালোবাসার জন্যে প্রাসাদ ছেড়ে আজ মাটির ধুলোয় নেমেছে।

-

মিজানুর রহমান রানা,
সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ, চাঁদপুর
ও হাজীগঞ্জ উপজেলা অঞ্চল প্রতিনিধি,
মাসিক সরগম।
সেল: ০৪৪৩৫০০৫৯০৯